কলকাতার দুর্গাপুজো

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫০-র দশকে কলকাতার দুর্গাপুজোয় মোটামুটি তিন ধরনের প্রতিমা দেখা যেত। সে-আমলেও পুজোর দিনগুলিতে দৈনিকপত্রে পুরো একটি পৃষ্ঠা জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিমার ছবি ছাপার রেওয়াজ ছিল। ১৯৫০ সালের এইরকম একটি পত্রিকায় দেখছি, প্রতিমার মূর্তিরূপ মোটামুটি তিন রকমের। একটি হলো সাবেকী একচালা প্রতিমা, যেখানে দেবী চার পুত্রকন্যাসহ একটি চালচিত্রের পটভূমিতে সংস্থাপিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সোনা, রাংতা আর জরির বিবিধ অলঙ্কার সম্ভার - এককথায় আমরা যাকে বলি 'ডাকের সাজ', এই ধরনের প্রতিমা এখনও প্রত্নবস্তু হয়ে যায় নি; তবে দেবী সেখানে অতটা রত্ন বিভূষিতা নন। তাঁর গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মতো হাতের তালু রক্তবর্ণ। অসুরের রঙ তামাটে নয়, গাঢ় সবুজ। এই ধরনের প্রতিমায় রঙের ব্যবহার সাবেকী মাটির পুতুলের ধারাই অনুসরণ করে চলে।

দ্বিতীয় ধরণের প্রতিমা হলো, যা আমরা এখন সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। এই ধরণের প্রতিমায় দুর্গা এবং তাঁর পুত্রকন্যাদের মূর্তিগুলি আলাদা - মূর্তির শিল্পরূপ স্বভাব অনুসারী বা ন্যাচারলিস্টিক। প্রায় মানুষের রূপেই যেন ধরায় নেমে এসেছেন দেবী - তাঁর দেহের বর্ণ হালকা গোলাপি, কখনও বা তা-তে একটু কমলা মেশানো। এক মাথা বাবরি চুল আর পেশল দেহ নিয়ে অসুরের চেহারাটিও এক ষন্ডা মার্কা ব্যক্তির মতোই। তবে ছবিতে দেখেছি আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে মহিষাসুর এতটা 'মাসকুলার' হয়ে ওঠেনি।

তৃতীয় যে ধরণের কথা বলব, দেবী সেখানে মূর্ত হয়েছেন এক বিশেষ শিল্পরূপে। তাঁর চোখমুখের গড়ন ঠিক মানুষের মতো নয় - এক অপার্থিব শিল্পভাবে মন্ডিত। পরনে ঘাগরার মতো বস্ত্র, বুকে কাঁচুলি। এই ধরনের প্রতিমায় দেবী সব ক্ষেত্রে দশভূজা নন - দুটি হাতে অস্ত্র ধারণ করেই তি নি বধ করছেন মহিষাসুরকে এবং মহিষাসুর মূর্ত হয়েছেন কখনও মহিষ, কখনও বা শুধুই মহিষমুন্ডের প্রতীকে। দেবীর বাহন সিংহটিকেও ঠিক সিংহের মতো দেখায় না - তার মুখ অনেকটা ঘোড়ার মতো। পঞ্চাশের দশকে এই ধরনের প্রতিমাকে বলা হতো 'ওরিয়েন্টাল' মূর্তি; আমরা ছোটবলোয় শুনেছি 'আর্টের ঠাকুর'।

একচালা ছেড়ে আজকের পরিচিত প্রতিমায় দেবীর রূপান্তর হয়েছিল ১৯৩০-র দশকের শেষে এবং উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যিনি দাবি করতে পারেন, তিনি হলেন কুমারটুলির প্রবাদপুষ গোপ্পের পাল। শিল্পবিদ্যা শিখতে তিনি ইউরোপ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিলেন এবং কলকাতার জনসমাজে পরিচিত ছিলেন জি. পাল নামে। ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে জি. পাল কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের জন্য যে প্রতিমাটি রচনা করেন, তার ছবি আমরা দেখেছি। মূর্তিগুলি সেখানে আলাদা আলাদা এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে বসানো। দেবীর চোখ অসুরের দিকে এবং তাঁর দৃষ্টিতে ক্রোধভাবে রয়েছে। অসুরটি তুলনায় শীর্ণ মহাশক্তিরূপিনী দেবীর সম্মুখে সে যেন কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছে, এরকম মনে হয়।

পতিমার গঠনরূপে গোপ্পের পাল এই যে নতুন ধারার সূচনা করলেন, খুব দ্রুত তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরের বছর (১৯৩৯) সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে দুর্গার যে প্রতিমারূপ দেখা গেল, সেখানেও মূর্তিগুলো আলাদা আলাদা ভাবে স্থা

পিত; তবে তাদের প্রত্যেকের পিছনের একটি করে চালচিত্র আছে। এই প্রতিমা তৈরি করেছিলেন নিতাই পাল। ৫০ ফুট চওড়া একটি বেদির ওপর মূর্তিগুলিকে বসানো হয়েছিল - দূর্গাপ্রতিমার উচচতা ছিল ১০০ ফুট। ব্যায়াম সমিতির সে ব ারের পুজো উদ্বোধন করেছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু।

উত্তর কলকাতায় সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৬ সালে। সার্বজনীন দুর্গাপুজো বলতে যা বোঝায়, ওই বছরেই তার প্রবর্তন করেছিল ওই সমিতিই। অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে 'বারোয়ারি' পুজো তার আগেও ছিল। তবে ছে াট আকারে। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অতীন্দ্রনাথ বসু দুর্গাপুজোকে একটা 'জাতীয়' উৎসবের রূপ দিতে চেয়েছিলেন বলে কথিত আছে। কলকাতার সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ইতিহাসে সে-প্রসঙ্গ এখন থাক। তার আগে আমরা বরং দেখি, গত পঞ্চশ বছরে দুর্গা প্রতিমার শিল্পরূপের বিবর্তনটা কোন্ ধারায় এগিয়েছে।

একচালা প্রতিমার একটা বহু প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, আমরা জানি। প্রস্তর বা দামুর্তির আদলেই এই রূপটি নির্মিত হয়েছিল, অনুমান করা যায়। জমিদারবাড়ি বা শহরের ধনী পরিবারে পুজোয় দেবী আসতেন এই একচালা প্রতিমার রূপ ধরেই। প্রথম দিকের বারোয়ারি পুজোর প্রতিমারূপেও সেই ধারাই অনুসৃত হয়েছিল। এলাকার ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তির াই তখন বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন; 'পাড়ার পুজো' ছিল বাড়ির পুজোরই এক বিস্তৃত রূপ। ১৯৪০-এর দশকেও কলকাতায় বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা হাতে গুণে বলে দেওয়া যেত।

তিরিশের দশকের শেষে গোপ্পের পাল এবং নিতাই পাল প্রতিমা শৈলীতে যে রূপান্তর নিয়ে এলেন, পন্ডিত সমাজ তাকে সহজে অনুমোদন করেন নি। কিন্তু ক্রমে দেবীর সেই চালহীন মূর্তিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৪০-র দশকে দৈনিকপত্রের ছবিতে দেখছি, একচালা প্রতিমার পাশাপাশি রয়েছে আলাদা ভাবে স্থাপিত মূর্তির সমাবেশও। তবে 'ওরিয়েন্টাল' ধার ার প্রতিমা এসেছে আরও কিছু পরে। কুমারটুলির প্রবীণ শিল্পী নিরঞ্জন পাল (বয়স ৮২) আমাদের জানিয়েছেন, ১৯৪০- র দশকের প্রথম দিকে অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই ধরণের প্রতিমা নির্মাণ করেন কুমারটুলির আর এক খ্যাতিমান শিল্পী এন.সি.পাল বা নিতাই পাল। বিভিন্ন প্রদেশে দুর্গার যে প্রতিমারূপ দেখতে পাওয়া যায়, তার ছবি দেখে সেই লক্ষণ মিলিয়েই নির্মিত হয়েছিল। ওরিয়েন্টাল ধারার মূর্তি। সে হিসাবে নিতাই পাল-ই ছিলেন এই ধারার প্রবর্তক।

তবে পত্রপত্রিকার ছবিতে আমরা দেখছি। এই ধারার বিস্তার হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে এবং প্রধানত দক্ষিণ কলকাতায় - পটুয়াপাড়ার শিল্পীদের হাতে। ওরিয়েন্টাল মূর্তি বা আর্টের ঠাকুরে দেবীর পোশাক, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি সবকিছুতেই একটা অন্য ধারার শিল্পভাব দেখতে পাওয়া যায়। মুখটি ভাবমন্ডিত; তবে পুরোন চিত্রপট বা একচালা প্রতিম ার থেকে তা পৃথক। শিল্পের একটা বিশেষ ইঙ্গিতময় ভাষা যে এই প্রতিমায় মূর্ত হয়েছে, তা আমরা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারি এবং সেই কারণেই এই প্রতিমাকে যেন একটু বিশেষ সমীহ দৃষ্টিতে দেখে থাকি। এই ধরনের প্রতিমা শৈলীতে নতুনত্ব আছে, উদ্ভাবনার চিহ্নও স্পষ্ট; কিন্তু তা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। সিংহের মুখ যে ঘোড়ার মতো দেখায়, ত ারও একটা ঐতিহ্য আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, বৈষ্ণব বাড়ির পুজোয় সিংহের মুখ হতো অ্যাকৃতি। সেই পরম্পর াকেই যেন অনুসরণ করা হয়েছিল ওরিয়েন্টাল প্রতিমায়; কখনও প্রাচীন কোন প্রস্তরমূর্তি ছবি, কখনও বা নন্দলাল বসুর মতো কোন প্রখ্যাত প্রতিকৃতিকে অবলম্বন করে।

শিল্পীরা মিউজিয়ামে গিয়ে মূর্তি দেখে আসতেন; প্রাচীন বিগ্রহের ছবি সংগ্রহ করতেন। এছাড়া শারদীয় দেশ, আনন্দবাজ ার প্রভৃতি পত্রিকায় তখন প্রতি বছর নন্দলাল বসু, নীরদ মজুমদার, রামকিঙ্কর প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা দুর্গার ছবি ছাপা হতো। ওরিয়েন্টাল প্রতিমা সেই চিত্র শিল্পকেও অবলম্বন করেছিল মনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত প্রতিমার জন্যই শিল্পীরা ছবি এঁকে দিতেন। ১৯৫৪ সালে নন্দলাল বসুর একটি ছবির আদলেই প্রতিমা রচনা করেছিলেন পটুয়াপাড়ার শ্রীশ পাল - সেটি পুজিত হয়েছিল হাজরা রোডের একটি পুজোমন্ডপে। প্রতিমা শিল্পীদের মধ্যে পেশাদার মৃৎশিল্পীদের প

াশাপাশি প্রতিষ্ঠান-শিক্ষিত তণ শিল্পীদেরও আমরা এই সময় দেখতে পাই। যেমন সেই বছরেই কলেজ স্কোয়ারের প্রতিমা গড়ে দিয়েছিলেন আর্ট কলেজের কয়েকজন ছাত্র। ১৯৫৮ সালে নন্দলাল বসুর ছবি দেখে প্রতিমা রচনা করেন গৌরগোপ াল বন্দ্যোপাধ্যায়।৩

ওরিয়েন্টাল প্রতিমা তখন বেশি দেখা যেত দক্ষিণ কলকাতায়-কালীঘাটের সঙ্গশ্রী বা ডোভার লেনের পুজোমন্ডপে। এরপর হরিশ মুখার্জী রোডে ২৩ পল্লী আর মুক্তদল-ও ওরিয়েন্টাল প্রতিমার এক চমৎকার প্রদর্শন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ত্রমে এই ধারা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও। ১৯৫৮ সালের পত্রিকায় দেখছি, বিডন স্ট্রিটেও এসে গেছেন ওরিয়েন্টাল প্রতিমা। নিরঞ্জন পাল জানিয়েছেন, তিনিও পঞ্চাশের দশকে ওই ধরনের প্রতিমা গড়েছেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির পর্যন্ত দেখে এসেছিলেন তিনি।

ওরিয়েন্টাল ধারার বিস্তার যে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। তার একটি কারণ মনে হয়, এই প্রতিমার নির্মাতারা বেশির ভাগই ছিলেন কালীঘাট পটুয়াপাড়ার শিল্পী। পটের ভাবমন্ডিত (আইডিয়ালইজ্‌ড) রূপটি তাঁরা খুব সুন্দরভাবে মূর্ত করে দিতেন মাটির বিগ্রহে। এইরকমই একজন শিল্পী হলেন শ্রীশ পাল। তাঁর পিতা রজনী চিত্রকার ছিলেন পটুয়াপাড়ার এক কৃতী শিল্পী। পটুয়াপাড়ায় প্রথম আমলে পট-ই আঁকা হতো আর মেয়েরা গড়তেন পুতুল। শিল্পীরা মুর্তি তৈরি করা শু করলেন বিশ শতকের প্রথম দিকে। যখন বিদেশ থেকে আসা ছাপা ছবি দখল করে নিয়েছে কালীঘাট পটের বাজার। অন্যদিকে বারোয়ারি পুজো শু হওয়ায় মূর্তির চাহিদাও বাড়ছে। এইসব কথা আমি শুনি পটুয়াপাড়ার শেষ দুই কৃতী শিল্পী বরেন্দ্রনাথ চিত্রকর আর শ্রীশ পালের মুখে। সেটা ১৯৭৮ সালের কথা। বরেন্দ্রনাথ তখন অতিবৃদ্ধ। রজনী চিত্রকর প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পুত্র শ্রীশ পাল তিনি চিত্রকরের বদলে পাল লিখতেন - কলকাতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন শিরিশ প াল নামে। শ্রীশবাবু বলেছিলেন; তবে বরাত পেলে পট এঁকে দেন। অন্যদিকে বরেন্দ্রনাথ চিত্রকার জানান, তিনিও যৌবনে পট-ই বেশি আঁকতেন সে হলো 'সাহেব আমলের' কথা; তবে পরের দিকে তিনি মুর্তিও গড়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, কালের প্রভাবে পটুয়াশিল্পীরা মূর্তিরচনার কাজে হাত লাগালেন এবং তাঁদের শিল্পধারাকে মূর্ত করে দিলেন প্রতিমায়। স্বাধীনতার পর কলকাতায় পুজোর সংখ্যা বাড়ল এবং বিশেষ কদল হলো ওরিয়েন্টাল প্রতিমার। ১৯৪৮ স ালে কলকাতায় সার্বজনীন পুজো হয়েছিল ২০০০টি। একটি বড় প্রতিমার দাম সে-আমলেও ছিল হাজার টাকার বেশি।৪ তখন একচালা ত্রমবিলীয়মান। ওরিয়েন্টাল, সেমি ওরিয়েন্টাল, মডার্ন ইত্যাদি নানা-ধারায় প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এবং নতুনত্বের নামে শিল্পবিকৃতিও ঘটছে। ১৯৫১ সালেই কমলকুমার মজুমদার বিরক্ত হয়ে লেখেন কুমারটুলির কিছু প্রতিমা 'জঘন্য' হয়ে উঠেছে।৫ চমক আনার নামে কিছু অদক্ষ শিল্পী এইসব কাজ করছিলেন, মনে হয়। উৎকৃষ্ট প্রতিমাও অবশ্য তৈরি হচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে ভবানীপুরের মিলনসাথী ক্লাবের জন্য গান্ধার শিল্পরীতি অনুসারে প্রতিমা গড়ে দেন মনুজ সর্বাধিকারী। হাজরার মৈত্রী সংঘে দেখা যায় রূদ্র পালের তৈরি সুন্দর ওরিয়েন্টাল প্রতিমা।৬

ওরিয়েন্টাল মূর্তি যেমন প্রতিমা নির্মাণশৈলীতে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করল, অন্যদিক থেকে তেমনি আর এক ধরণের পরিবর্তন নিয়ে এলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা মৃৎশিল্পীরা। এঁদের মধ্যে রমেশ পাল স্বনামধন্য এবং ভাস্কর হিস াবেও তিনি প্রসিদ্ধ। অন্যদের মধ্যে ছিলেন রাখাল পাল, কার্তিক পাল, গোপাল পাল প্রমুখ। ১৯৫০-র দশকে এঁরা দুর্গ ার যে প্রতিমায় নিয়ে এলেন সেখানে দেবী কখনও ভীষণা রূদ্রানী, কখনও বা স্নেহময়ী, শক্তিময়ী জননী। যেমন ১৯৫৪ স ালে মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে রমেশ পাল যে মূর্তি গড়েন, সেখানে দেবীর পরনে বাঘছাল, বুকে কাঁচুলি। অ াবার ওই দশকেই পার্কসার্কসের জন্য তৈরি তাঁর যে প্রতিমার ছবি ক্যালেন্ডারে ছাপা হয়ে ঘরে ঘরে শোভা পেত, দুর্গার রূপ সেখানে অন্যরকম। শাড়ি জামা পরেই আবির্ভূত হয়েছেন তিনি; তাঁর এক পা সিংহের পিঠে। আর এক পা মহিষ াসুরের বুকে। এক হাতে তিনি ধরেছেন অসুরের মাথার চুল, অন্য হাতে বিদ্ধ করছেন তাকে ত্রিশূল দিয়ে। দেবীর চোখে ত্রে াধ; কিন্তু তা অগ্নিবর্ষী নয়, অদ্ভুত দীপ্তিময়ী। মাতৃরূপের এক স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাঁর সারা মুখটিতে।

পুরনো আমলের একচালা মূর্তি যেমন, আধুনিক ওরিয়েন্টাল প্রতিমাতেও তেমনি দেবীর মুখ সাধারণত সম্মুখবর্তী। তিনি বধ করছেন শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত; কিন্তু চেয়ে আছেন দর্শকের দিকে। রমেশ পাল এবং তাঁর অনুগামীরা এর জায়গায় নিয়ে এলেন এক নতুন শিল্পরূপ। দেবীর দৃষ্টি আমাদের দিকে নয়, বধ্য মহিষাসুরের দিকে। তাঁর চোখ ডাকের সাজের প্রতিমার মতো টানা টানা, আকর্ণ বিস্তৃত নয়; বরং নিখুঁত পটলচেরা। মুখ পান পাতার মতো। নাকের গড়নে আছে তিলফুলের অ াদল। নাকচোখের এইরকম গড়ন কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা থেকেই। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পটলচেরা চোখের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না ঠিকই; তবে অজন্তার গুহাচিত্রে এর নিদর্শন আছে। কোমর বাঁকিয়ে দাঁড় ানো ত্রিভঙ্গ অতিভঙ্গ মুদ্রাও শিল্প শাস্ত্রবিহিত এবং সেই লক্ষণ অনুসারে নির্মিত প্রস্তর মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে। সেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভঙ্গিমাটিকেই মাটির প্রতিমায় নিয়ে এসে এক অপূর্ব শিল্পরূপে মন্ডিত করে দিলেন রমেশ পাল, রাখাল পাল, নিরঞ্জন পাল, জিতেন পাল প্রমুখ শিল্পীরা। সাবেকী একচালা প্রতিমায় দেবী দাঁড়িয়ে থাকেন সোজা হয়ে, সমভঙ্গ মুদ্রায়। এই নতুন রীতির প্রতিমায় দেখা গেল দুর্গা দাঁড়িয়েছেন কোমর বাঁকিয়ে, অসুরের দিকে একটু ঝুঁকে। এর ফলে আশর্চ্য এক গতিময়তা এসেছে তাঁর দেহ ভঙ্গিমায় - দেবীকে আমরা দেখছি একেবারে শত্রু দলনে উদ্যত অবস্থায়।

প্রতিমার পিছনে চালচিত্র কখনও থাকল, কখনও থাকল না। গহনা কখনও মাটির হলো; কখনও বা তাকে আরও চ াকচিক্যময় করে তোলা হলো শোলার সঙ্গে জরি আর রাংতা জুড়ে। সব মিলিয়ে দেবী দেখা দিলেন বাঙালিনী নারীর র ূপে। তাঁর মাথায় কখনও মুকুট, কখনও জটাজুট; কখনও বা তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আলুলায়িত কেশ নিয়ে। চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধের দীপ্তির সঙ্গে মিশেছে কণার প্রসন্নতাও। দেবী রণে লিপ্ত; কিন্তু তার রূপটি যেন মঙ্গলময়ী জননীর।

এই প্রতিমা শৈলিকে তখন বলা হতো 'বাঙলা স্টাইল'। পূর্ববঙ্গের অনুষঙ্গ এনে কেউ কেউ এর নাম দিয়েছিলেন 'বাঙাল দুর্গা'। প্রতিমা শিল্পীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গর একটা রীতিগত বিভাজন এই সময় থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুম ারটুলিতে এই ভাগটা আজও একই রকম বজায় আছে। বনমালি সরকার স্ট্রীটের বাসিন্দারা সকলেই প্রায় পূর্ববঙ্গের শিল্পী। অন্যদিকে গোপ্পের পাল-নিতাই পাল লেনে আছেন কুমারটুলির আদি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গীয় শিল্পীরা তাঁরা এসেছিলেন ঊনিশ শতকে নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে। ঠাট্টা করে এই দুই পল্লীকে হিন্দুস্থান - পাকিস্তান বলেও চিহ্নিত করে থ াকেন কেউ কেউ। পূর্ববঙ্গীয় শিল্পীরা দাবি করেন, আজকের প্রচলিত প্রতিমারূপটিরস্রষ্টা তাঁরাই। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গীয় শিল্পীদের অভিমত, এই স্টাইল আগেও ছিল; তবে পূর্ববঙ্গের শিল্পীরা তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

দুটি বক্তব্যের ভেতরেই কিছু সত্য আছে। মডার্ন, ওরিয়েন্টাল বা বাঙলা স্টাইল এই তিনটি ধারারই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, পৌরাণিক পরম্পরাকে মর্যাদা দিয়ে আজও যোগ করা হচ্ছে নতুন শিল্পমাত্রা। পন্ডিত সমাজের ভ্রুকুটি সত্ত্বেও তাঁদের প্রতিমা সমাদৃত হয়েছিল এই কারণেই। এরপর ১৯৬০-র দশকে প্রতিমার মুখের ছাঁদে কোন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর আদল নিয়ে আসা হলো। যুগের ফ্যাশন অনুসারে ঝুল-ছোট ব্লাউজ পরিয়ে দেওয়া হলো দুর্গাকে। তারপর সুপুরি, চিনাবাদ ামের খোলা থেকে শু করে আলপিন পর্যন্ত নানা রকমের জিনিস দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই সব চি- বিবর্জিত চমক খুব বেশি দিন চলেনি। পুরোন রীতিই বরং আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে। শিল্প সুষমাময় শৈলী নিয়ে ন ানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। একেবারে সাম্প্রতিক কালের প্রতিমা আমাদের আলোচ্য নয়। এখানে আমরা এইটুকু কেবল মনে রাখি, নানা ধরনের শিল্পসম্মত উদ্ভাবনার প্রয়াস ১৯৬০-র দশকেও দেখা গেছে। কালীঘাটের সঙঘশ্রী ক্লাবের একটা অগ্রণী ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে। ১৯৫৪ সালে তাঁদের প্রতিমায় দেবী পদ্মাসীনা; পুত্র কন্যারা আ বির্ভুত হচ্ছেন মেঘের আড়াল থেকে। আর একবার দেখা গেল, ত্রিশূলটি শূন্যে দেবী নিক্ষেপ করেছেন এবং তা দ্রুত ধা বিত হচ্ছে মহিষাসুরের দিকে। পটভূমিকায় মেঘ-পর্বত এঁকে রাখা এরপর একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়, তবে সঙঘশ্রীর শিল্পনৈপুণ্য সব জায়গায় পাওয়া যেত না। সঙঘশ্রীতে পটভূমিকা রচনার কাজটা যাঁরা করতেন, তাঁরা অনেকেই ভালো শিল্পী - স্টুডিওয় সিনেমার সেট আঁকতেন - ফলে তাঁদের কাজ খুবই নিখুঁত হতো। ভবানীপুর অঞ্চলে এইরকম এক শিল্পী

ছিলেন প্রাদ পাল। তাঁর হাতের কাজে প্রতিবছরেই কিছু নতুনত্ব থাকত। যেমন একবার তিনি মূর্তিগুলি স্থাপন করলেন এক একটা বড় সরার ওপর। আর একবার তাঁদের বসানো হলো কাঠের কাকাজ করা কলকার ভেতরে। নতুনত্বের নামে প্রতিমাশিল্পে যখন নানা ধরণের বিকৃতি আর কুচির চর্চা চলছে সেই সময়েই কাজ করেছেন এই শিল্পীরা। শুধু শোলার ক াজ যে কত সুন্দর হতে পারে, তা দেখিয়ে দিয়েছিল ভাবনীপুরের সঙঘমিত্র, ১৯৬৮ সালে। শিল্পী ছিলেন সম্ভবত অনন্ত ম ালাকার।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোই কলকাতার প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। উনিশ শতকেও বারোয়ারি পুজো ছিল এবং চাঁদার জুলুমও কিছু কম হতো না - এমন কথাও আমরা শুনেছি। তবে দুর্গাপুজোকে একটা সার্বজনীন উৎসব এবং প্রদর্শনী করে তোলার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সিমলা সমিতিরও। স্বদেশী যুগের পটভূমিতেই এই ব্যায়াম সমিতির জন্ম হয়। প্রতিষ্ঠাতা অতীন্দ্রনাথ বসু অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শরীরচর্চার একটা আখড়া তিনি গড়ে তুলেছিলেন অনেক আগে - সেই স্বদেশী যুগের পূর্বেই। ১৯২৬ সালে তিনি যে দুর্গাপুজোকে একটা জাতীয় উৎসবের রূপ দিতে উদ্যোগী হলেন, তার পিছনে জাতীয়তাবাদী চেতনা যেমন ছিল, তেমনি আবার ছিল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির একটা অশুভ প্রভাবও। ১৯১৯ সালে কলকাতায় একবার হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হয়েছিল। এরপর ১৯২৬ স ালের এপ্রিল আর জুলাই মাসে পর পর দু-বার দাঙ্গা হয় কলকাতায়। হিন্দু-যুব সমাজের একাংশ এরপর নতুন করে শরীর চর্চায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। সিমলা সমিতির ওপরেও তার প্রভাব পড়েছিল। তবে বিপ্লবী দলের সদস্য অতীন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের আড়ালে শক্তিচর্চা; এবং দুর্গাপুজোকে এমন একটি বৃহত্তর অনুষ্ঠানে পরিণত করা, যেখানে বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মাতৃপূজায় যোগ দিতে পারবে। অষ্টমীর দিন সকালে 'বীরাষ্টামী' অনুষ্ঠানে লাঠি ছুরি খেলা, মল্লযুদ্ধ এবং শরীরচর্চার প্রদর্শনী হতো। এছাড়া থাকত পুতুল প্রদর্শনী তাতে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরা হতো। সিমলার প্রেরণায় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবেও 'বীরাষ্টামী' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কয়েক বছর পরে।৭

সমসাময়িক রাজনীতির পটভূমিতে শক্তিপূজাকে এইভাবে এক বৃহত্তর তাৎপর্যে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন অতীন্দ্রনাথ বসু। ১৯৩৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় এই পুজো সম্পর্কে লেখা হয়, 'পূজার তিন দিন সহস্র সহস্র হিন্দু ছোট-বড় ভেদ ভূলিয়া সমবেত ভাবে মায়ের পায় অঞ্জলি দিয়াছে এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে।'৮ একদিকে বিপ্লবী আদর্শের প্রচার, অন্যদিকে হিন্দুদের সংহত করে তোলার উদ্যোগে এই দুই রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখেই শু হয়েছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গোৎসব। লোকে প্রতিমা দেখে বলত 'স্বদেশী ঠাকুর'। শরীরচর্চা আর অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনী করে যুব সমাজকে যে অন্য এক আদর্শে দীক্ষিত করতে চাওয়া হচ্ছে। তা বুঝতে ব্রিটিশ সরকারেরও দেরি হয় নি। ১৯৩২ সালে সমিতিকে তাই দু-বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কোনভাবে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিনা আমরা জানি না। তবে গ্রামের মুসলম ানরাও কলকাতার পুজো দেখতে আসতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, তাঁরা মন্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিমাকে তিনবার 'সালাম সালাম' বলে চলে যেতেন। অমাদের শৈশবে শোনা 'কী দুগ্‌গি দেখলুম চাচা' ছড়াটির জন্মও বোধহয় এইরকম কোন উপলক্ষ থেকে।

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পুজোর সঙ্গে মূসলমানদের একটা যোগাযোগ ছিলই। পটুয়াপাড়ার চিত্রকর শিল্পীরা যে এককালে মুসলমান হয়েছিলেন, তা সকলেই জানতেন কিন্তু তাঁদের নির্মিত প্রতিমা গ্রহণে কোন বাধা ছিল না। ডাকের সাজের জন্য জরির গহনা তৈরি করতেন মুসলমান কারিগরেরা। কুমারটুলি অঞ্চলে সুববা বলে এক যুবক শিল্পীদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল বলে জানা যায়। সে প্রতিমা বহনের কাজও করত। সেই অপরাধেই নাকি ১৮৪৬-র দাঙ্গায় তাকে প্রাণ দিতে হয়।৯

হিন্দুদের উৎসব হলেও কলকাতার দুর্গাপুজো সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। আকাশবাণীর 'মহিষাসুর মর্দিনী' অনুষ্ঠানের প্রথম দিকের যন্ত্রশিল্পীরা ছিলেন বেশিরভাগই মুসলমান এবং চিরকাল চন্ডীপ াঠ করেছেন একজন অব্রাহ্মণ। তা নিয়ে কোন আপত্তি হয়নি। প্রতিমার নানা রূপান্তরও গৃহীত হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও দুর্গাপুজোর উৎসবকে প্রথম থেকেই প্রভাবিত করেছে। সিমলা ব্যায়াম সমিতি যে পুতুল প্রদর্শনীর প্রবর্তন করেছিল, স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন এলাকায় তার ধারা নানাভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রতিটি পুজামন্ডপেই জাতীয় পতাকা শোভা পেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে একটি মন্ডপে কার্তিক ঠাকুর উপস্থিত হয়েছিলেন গান্ধিটুপি পরে। গান্ধীজী নেতাজী নেহের প্রতিকৃতির পাশাপাশি রাখা হয়েছিল হায়দরাবাদে সামরিক অভিয ানের নায়ক জয়ন্ত চৌধুরীর ছবি; কোথাও কীরের শেখ আবদুল্লার প্রতিকৃতিও।১০ হায়দরাবাদ আর কীরের ভ ারতভুক্তিকে এইভাবে সেলিব্রেট করেছিল কলকাতার দুর্গোৎসব। ভাসানের দিন 'দুর্গা মাইকী জয়'-এর সঙ্গে 'বন্দে ম াতরম' ধ্বনিও শোনা গিয়েছিল। ঢাকাতেও মুসলমানরা নিরঞ্জন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং হিন্দুদের মুখে ছিল 'পা কিস্তান কী জয়' ধবনি। তবে তা কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, সন্দেহ হয়; কারণ স্বাধীনতার ঠিক পরে কোন বড় দাঙ্গা না হলেও, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং এক দল তখনই দেশ ছাড়তে শু করেছেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় দুর্গাপুজো হয়েছিল ৪০টি; ১৯৫০ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১২টিতে।

দুর্গোৎসবের সঙ্গে সমসাময়িক কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে যুক্ত করে দেওয়া - কলকাতার দুর্গোপুজোর এক প্রলক্ষণ বলা যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হয়েছিল পুজোর ঠিক আগেই। বেশ কিছু মন্ডপে তাই দেখা গিয়েছিল 'বীর জাওয়ানদের' মৃন্ময় মূর্তি। একই ধারায় গত কয়েক বছরে কলকাতার পুজো শ্রদ্ধা জানিয়েছে সত্যজিৎ রায়, মাদার টেরিজা বা অমর্ত্য সেনকে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উৎসব হয়েও কলকাতার পুজো বারবারই একটা বৃহৎ, ব্যাপ্ত র পে প্রকাশিত হতে চেয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে গৌণ করে দিয়ে সেকুলার উৎসব করে তোলা হয়েছে পুজোকে। তবে তার পিছনে উগ্র জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রভাব কখনও কখনও কাজ করেছে। ২০০১ সালে পুজোর আগে একটা খবর ছিল, কোথাও কোথাও অসুরকে গড়া হচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের আদলে। এই প্রবণতা নতুন নয়। যবনর পী মহিষাসুর আমরাও শৈশবে দেখেছি। আবার ছেলেরা ঢাকে তাসার বোল ফোটাচ্ছে আর প্রবীণেরা ষ্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে; অন্যদিকে থেকে এসেছে আর এক রকমের সাম্প্রদায়িকতা। এই সব কিছু নিয়েই কলকাতার দুর্গোৎসব।

সেই ১৯৩০-র দশক থেকে যদি ভাবি বাঙলায় কত ভাঙাগড়া, উত্থানপতন আর ঝড় বৃষ্টিই না বয়ে গেছে গত সত্তর-পচঁ াত্তর বছরে। দুর্গাপুজোর উৎসবে কিন্তু ভাঁটা পড়ে নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যায় ১৯৪৬ সাল। ওই দাঙ্গার বছরে অক্টোবরের প্রথম যখন দুর্গা ঘরে আসছেন, কলকাতার অঞ্চলে অঞ্চলে তখনও বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ চলছে। মাঝে মাঝে কারফিউ। লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজ, আর আশুতোষ কলেজে শরণার্থী শিবির। অনেক দোকান বাজারই বন্ধ, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। 'বঙ্গশ্রী'নামের একটি পত্রিকা (আশ্বিন, ১৩৫৩) লিখেছিল, 'আজ পূজার বাজার প্রাণহীন। ভিড় নাই, স্পন্দন ন াই, উৎসাহ নাই।' আকাশবাণী সেই বছর মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠান প্রচার করে। রেকর্ড বাজিয়ে ঈদ উৎসবও পালিত হয়েছিল এক বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশে; কারণ অনেক মানুষই তখনও ঘরছাড়া।

এই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর কোন ঘটনাই কলকাতার দুর্গাপুজোকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। মহামন্বন্তরের বছরেও (১৯৪৩) পাড়ায় পাড়ায় পুজো হয়েছে এবং ক্ষুধার্ত মানুষদের মন্ডপে ডেকে এনে খাওয়ানো হয়েছে।১২ রাস্তায় লোকে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে; আর অঞ্চলে অঞ্চলে তখন উৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাস-এর ভেতর একটা অসহ্য নির্দয়তা আছে। কলকাতার দুর্গোৎসব তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। তবে উদ্যোক্তারা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে সাহায্য করে। ১৯৪৮ সালে যখন পুজো হচ্ছে, শিয়ালদহ স্টেশনের চত্বরে শরণ ার্থীরা তখন প্রায় খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু পুজো হয়েছে; এমনকি শরণার্থীরাও পুজোর অ

ায়োজন করেছেন তাঁদের দুর্গতিকে একটি কালো রঙের প্রতিমায় চিহ্নিত করে দিয়ে।১৩

১৯৫০র-দশকে প্রায় প্রতি বছরই পুজোর আগে বন্যায় গ্রাম ভেসে যেত। কলকাতার উৎসবে কিন্তু তার ছাপ বিশেষ পড়ত না। তবে পুজোর খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে বন্যাত্রাণে সাহায্য করার প্রথাও ছিল। আনন্দমেলা আর ছোটদের পাতাড়িতে শিশুদেরও সেই উপদেশই দিতেন মৌমাছি আর স্বপনবুড়ো। পুজো সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হতো, 'দুর্গত বাঙলায় আজ দুর্গতিনাশিনীর আরাধনা, ইত্যাদি।'

কলকাতার দুর্গাপুজো মানে প্রানান্তকর ভিড়, অফুরন্ত আমোদ, অর্থের অপরিমিত অপচয় সব মিলিয়ে কয়েকটা দিন এক উদ্দাম, উন্মত্ত মোচ্ছব। এই কালচার সেই হুতোমের কাল থেকেই চলে আসছে, আমরা জানি। সার্বজনীন পুজো শু হওয়ার পর উৎসবের এই রঙ বাহার আর জাঁকজৌলুস নিঃসন্দেহে আরও ব্যাপক হলো। তিরিশের দশকের কলকাতায়ও পুজোর সময় প্রচন্ড ভিড় হতো। তবে চলাচলে বাধা ছিল না। একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ঘুরে আসা যেত।

উৎসবের নামে বেলেল্লাপনা অবশ্য সে আমলেও ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বাড়ির ঠাকুর ভাসানের সময় বাবুরা নেশা করে, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য করিতে করিতে ..... চলিতেন।১৪ এই কালচারের ই আরও ব্যাপক রূপ দেখা গেল বারোয়ারি পুজোয়। অশালীন আচরণ, উন্মত্ততা আগেও ছিল; তবে ইতরামিটা শু হয় সম্ভবত যুদ্ধের সময় থেকে, যখন লোকের হাতে প্রচুর কাঁচা টাকা এল। স্বাধীনতার পর স্বাধিকার প্রমত্ত যুবসমাজ স্বভাবতই এর পূর্ণ সুযোগ নেয়। ১৯৫০ সালের দৈনিক পত্রে পড়ি, গভীর রাত পর্যন্ত মাইক্রোফোন বেজেছে।১৫ ১৯৫৪ সালে এই উপদ্রব একটু কমেছে-বাঙলা গানই বেশি শোনা যাচ্ছে; তবে ভাসানের দিন ছেলেরা মাথায় মাল বেঁধে গাইছে, 'হো লালা, হো লাল া'।১৫ ১৯৫৮ সালেও সেই একই দৃশ্য, সাপের মতো বেলুন মাথায় জড়িয়ে, 'হিচক দানা, বিচক দানা', 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানী', ইত্যাদি। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় ২০০টি পুজো হয়েছিল - দশ বছরের মধ্যে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০০ ; এক একটা পুজোয় খরচ হচ্ছে তখন আট থেকে বারো হাজার টাকা।১৬

১৯৫৯ এবং ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন কলকাতাকে রণক্ষেত্র করে তুলেছিল। কিন্তু পুজোর উৎসবে তার খুব ছাপ পড়েনি। জননেতা বা বুদ্ধিজীবীরা উদ্বোধনী ভাষণে শুধু বলতেন, এ বড় নিষ্ঠুর পরিহাস-মাতা অন্নপূর্ণা এসেছেন নিরন্ন বঙ্গ দেশে। উৎসবের আনন্দোচ্ছাসে কিন্তু কোন ঘাটতি দেখা যেত না। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল একটি অ-কংগ্রেসী সরকার - কলকাতার গোটা যুবসমাজটাই তখন বামপন্থী। পুজো কিন্তু পুরনো ধারাতেই চলছে। শুধু কোন মন্ডপের সামনে টেবিল সাজিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে রাশিয়ায় ছাপা মার্কসবাদী সাহিত্য। ১৯৬৮ সালে আড়াই টাকা দিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কির 'আমার ছেলেবেলা' কিনেছিলাম কালীঘাটের এই রকম একটি মন্ডপ থেকেই।

১৯৬০ দশকের বা সত্তরের প্রথমে নকশালবাড়ি আন্দোলনের দিনেও পুজোর উৎসব রূপে তেমন কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন আসেনি। পাড়ার অনেক ছেলেই তখন জেলের ভেতরে অথবা আত্মগোপন করে আছে। পুজোর দিনেও মাঝে মাঝে বোমার আওয়াজ পাওয়া গেছে। টুইস্ট নাচ-ও আবার পুজোর কালচারে মিশে গেছে সেই সময়েই। চিশীল সাহিত্য পত্রিকার পাশাপাশি সাজানো থেকেছে 'জীবন যৌবন', 'নতুন জীবন', 'পঞ্চশর' নামের সব পিন আঁটা পত্রিকাও। পাড়ায় পাড়ায় গগন বিদীর্ণ করে সারা দিন ধরে বেজেছে 'বোল রাধা বোল' আর 'বুড্ঢা মিল গয়া'; রাত দশটার পর আবার কোন কোন অঞ্চলে শোনা গেছে দেবব্রত ঝিাস বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত - শাপমোচন বা শ্যামা গীতিনাট্য। এই সবকিছু নিয়েই কলকাতার পুজো। বিবিধ সংস্কৃতির এক বিচিত্র সম্মিলন।

ব্যাবসায়ীদের বিজ্ঞাপনে বা ইস্কুলের পাঠ্যবইয়ে দুর্গাপুজো আজও 'বাঙালির জাতীয় উৎসব' বলে কীর্তিত হয়ে থাকে।

কিন্তু এই দাবি যে অর্ধসত্য, তা সকলেই জানেন। বাঙালি মুসলমান সমাজ এই আনন্দোৎসবের প্রত্যক্ষ শরিক নন;১৭ আবার অবাঙালি সমাজকে বাদ দিয়েও এই উৎসবের কথা কল্পনা করা যায় না। দুর্গাপুজো কলকাতার সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসব - এইটুকু হয়ত বলা যায়; কিন্তু সেই সংস্কৃতির কোন একটা নির্বিশেষ বা সমজাতীয় সত্তা নেই। তার ভেতর নানা প্রকার আছে, বর্গভেদ আছে। উচচবর্গ সমাজ সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা রচনা করে, নিম্নবর্গ সেই বিহিত সীমা বারবার ভেঙে দেয়, উৎসবকে বিকৃত, বিক্ষত করে দিয়ে। মিখাইল বাখতিন ইউরোপের কার্নিভাল উৎসবকে যেভাবে বিশ্লেষ করেছিলেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে কলকাতার দুর্গাপুজোকে ভদ্রসমাজের কাছে যা বেলেল্লাপনা বা ইতরামি বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতরেই রয়ে গেছে নিম্নবর্গের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রক্ষেপ। উচচবর্গের আধিপত্য, তার বিশুদ্ধ সংস্কৃতির দম্ভটাকেই যেন ভাঙতে চায় নানা ধরনের অতিচার আর অপচার।

সেই ১৯৫০ দশক থেকেই কলকাতায় দুর্গাপুজোয় শুধু তিন ধরণের প্রতিমা নয়, উৎসবেরও তিনটি প্রকাশরূপ দেখে আসছি আমরা। কোন কোন পাড়ার পুজো 'লোফার'-'ক্যাওড়া'দের পুজো সেখানে সারাক্ষণ মাইকে হিন্দি গান বাজে। ছেলেরা অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গি করে নাচে; ভাসানের দিন মারপিট হয়, সোডার বোতল, এমনকি ছোরাছুরিও বেরিয়ে পড়ে কখনও কখনও। এরই পাশাপশি আছে ভদ্র পাড়ার 'বনেদী' পুজো, যার তত্ত্বাবধান করেন প্রবীণ ব্যক্তিরা শুদ্ধবস্ত্র পরিহিত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধমন্ডলী। সেখানে ভোরবেলা সানাই বাজে, সন্ধ্যায় চন্ডীপাঠ; পুজো হয় 'শাস্ত্রমতে'। আর এই দুই মের মাঝামাঝি আছে, যাকে বলা যায়, মধ্যবিত্ত পাড়ার পুজো যেখানে অতিচার আছে, আবার একটা সীমার পর সংযমও বজায় রাখা হচ্ছে। 'লারে লাপ্পা' গান হচ্ছে; আবার কখনও কখনও রবীন্দ্রসংগীতও বাজানো হচ্ছে - রবীন্দ্রনাথ এখানে শুদ্ধ সংস্কৃতির আহিত প্রতীক।

২০০০ সালে বিজয়া দশমীর দিন কলকাতার বাবুঘাটে দাঁড়িয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখেছিলাম ঘন্টা দুয়েক। প্রতিমার শিল্পরূপে যেমন, উৎসবের আচরণ আর প্রকাশভঙ্গিতেও তেমনি স্পষ্ট চিহ্নিত হয়ে আছে এই তিনটি সাংস্কৃতিক প্রকার - আজও।

তথ্যসূত্র

১। বীরেন্দ্রনাথ বসু, 'বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু স্মরণে', পৃ. ৫৪-৫৫।
২। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা', ১৯৭৮, পৃ. ১২৩।
৩। যুগান্তর ৪ অক্টোবর ১৯৫৪; ২০ অক্টোবর, ১৯৫৮।
৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ অক্টোবর ১৯৪৮।
৫। কমলকুমার মজুমদার, 'বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', ১৪০৫ ব।, পৃ. ৯১-৯২।
৬। যুগান্তর, ১১ অক্টোবর, ১৯৫৪।
৭। বীরেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬১।
৮। বীরেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, প;. ৫৯।
৯। জয়ন্ত দাস, 'বাঙাল দুর্গাই জিতলেন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ অক্টোবর, ২০০০।
১০। অমৃতবাজার পত্রিকা ১১ ও ১৪ অক্টোবর, ১৯৪৮।
১১। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২২ অক্টোবর, ১৯৫০।
১২। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৯, ১১ অক্টোবর, ১৯৪৩।
১৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ অক্টোবর, ১৯৪৮।
১৪। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলিকাতায় চলাফেরা', ১৯৮৮, পৃ. ২৩।
১৫। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২০ অক্টোবর, ১৯৫০।

১৫ক। যুগান্তর, ৭ ও ৯ অক্টোবর, ১৯৫৪।
১৬। যুগান্তর, ২০ অক্টোবর, ১৯৫৪।
১৭। তবে কোন কোন অঞ্চলে পুজো কমিটিতে দু-একজন মুসলমান সদস্যও থাকেন।

মৌখিক সূত্রঃ

শিল্পী শ্রী নিরঞ্জন পালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২১মে ২০০২; ১৯৩০-৪০ দশকের কলকাতার দুর্গাপুজো সম্পর্কে আলোচনা করেছি অধ্যাপক শ্রী অশোক সেন এবং অধ্যাপক শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের সঙ্গে। কালীঘাট পটুয়াপাড়ার শ্রী বরন্দ্রেনাথ চিত্রকর এবং শ্রী শ্রীশ পালের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ১৯৭৮ সালের ডায়েরির সেই পুরনো নোট-ই ব্যবহার করেছি।

দুর্গা প্রতিমার প্রাচীন মূর্তিরূপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শক্তির রূপ' ঃ ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়' গ্রন্থ (১৯৯০) থেকে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com